জাতীয় উন্নয়নে গণসাক্ষরতা এবং শিক্ষার বিস্তার

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় এবং চিকিৎসার পরেই শিক্ষার স্থান। উল্লেখিত মৌলিক অধিকার বা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য ন্যূনতম প্রয়োজনের মধ্যে শিক্ষার স্থান পরে হলেও, আসলে এর প্রয়োজনীয়তাই বেশী। কেননা, খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা ইত্যাদি যাই বলিনা কেন, এর সবকিছুর সঙ্গেই শিক্ষা জড়িত। জ্ঞান-বুদ্ধি, মেধা-প্রতিভা, কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা—সবকিছুর বিকাশের জন্যই শিক্ষা অপরিহার্য। আর উপার্জন এবং আর্থিক সামর্থ্য অর্জনের জন্য যে শিক্ষা খুবই জরুরী তা নতুন করে বলার বা বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে না। শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা যে নিরক্ষর ও শিক্ষাবঞ্চিত ব্যক্তিদের চেয়ে বেশী উপার্জন করে থাকে, সেটা তো জানা কথা। এর ব্যতিক্রম সমাজে অবশ্যই আছে, কিন্তু ব্যতিক্রম কখনো নিয়ম নয়। শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা যে সমাজে অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুত, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি যে দিক থেকেই দেখা হোক না কেন, শিক্ষিত লোকের অবস্থান, গুরুত্ব, মূল্য ও মর্যাদা আলাদা। আমাদের এই জনবহুল দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে যে জনশক্তি ও জনসম্পদে পরিণত করা যাচ্ছে না, শিক্ষার নিম্নহার, উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যাল্পতা এবং ব্যাপক নিরক্ষরতা তার প্রধানতম কারণ। একই কারণে আমাদের দেশে ব্যাপক দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে বিপুল জনগোষ্ঠীর অধিবাস। তাদের জীবনযাত্রার মান যে অত্যন্ত নীচু তারও প্রধানতম কারণ ব্যাপক নিরক্ষরতা ও শিক্ষার অভাব এবং প্রকট দারিদ্র্য।

দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে ও জনসম্পদে পরিণত করা, দারিদ্র্যমোচন এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্যে চাই নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ব্যাপক সাক্ষরতা তথা গণসাক্ষরতা এবং শিক্ষার বিস্তার। সাক্ষরতা ও শিক্ষার অভাব যেমন আমাদের দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যের প্রধানতম কারণ, তেমনি ব্যাপক দারিদ্র্যও শিক্ষা বিস্তারের পথে বড় অন্তরায়। এ দুইয়ের সম্পর্ক এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, একটার থেকে অন্যটাকে আলাদা করে দেখাই কঠিন। ব্যাপক দারিদ্র্য ও শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতার কারণে এবং ব্যয়বহুলতার দরুন দেশের সবাইকে শিক্ষিত করে তোলা এবং উচ্চ-শিক্ষা দেওয়া কতটা সম্ভব তা অবশ্যই ভাবনার বিষয়। বারো কোটি জনঅধ্যুষিত এই দেশে সবাইকে সাক্ষর করে তোলার অর্থাৎ গণসাক্ষরতা কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানোর পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারের এবং যথাসম্ভব উচ্চশিক্ষা প্রদানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাও আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, ব্যাপক গণসাক্ষরতা অর্জন এবং শিক্ষা বিস্তার ছাড়া যে দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে জনশক্তি ও সম্পদে পরিণত করা সম্ভব নয় এবং দারিদ্র্যবিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে এ সব অত্যাবশ্যক এই সত্য অনস্বীকার্য। বাস্তব কারণেই বর্তমান সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা বিস্তারের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে।

মানুষের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন এবং অধিকারের প্রশ্নে সর্বপ্রথমেই আসে খাদ্যের কথা, বস্ত্র ও আশ্রয়ের কথা। খাদ্যের নিশ্চয়তা বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যক, তার পরেই বস্ত্রের স্থান। অবশ্য সভ্য ও সামাজিক মানুষের জন্য বস্ত্রের আবশ্যকতা এবং নিশ্চয়তা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, খাদ্যের সংস্থানের জন্যও সভ্য ও সমাজবদ্ধ মানুষকে বস্ত্র ব্যবহার করতে হয়। আব্রু রক্ষা করতে হয়। তবুও, বস্ত্র ও আশ্রয় ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে।

কিন্তু খাদ্য ও পানীয় ছাড়া বেঁচে থাকা-এমনকি প্রাণ ধারণ কঠিন। সুতরাং, খাদ্যের ব্যবস্থা ও নিশ্চয়তা অপরিহার্য প্রাথমিক প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে এবং তুলনা-মূলকভাবে দেখলে, শিক্ষার মৌলিক অধিকার ও তা নিশ্চিত করার প্রশ্নে—সর্বপ্রথম আসে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সাক্ষরতা অর্জনের ব্যাপার। তত্ত্বকথার মতো শোনালেও এ সত্য তো অনস্বীকার্য যে, ক্ষুধা নিবারণ ও জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম পক্ষে 'একটু ভাত—একটু নুন' অবশ্যই চাই, আর নিদেনপক্ষে 'ডাল-ভাত'-এর ব্যবস্থা করতে পারলে তো কথাই নেই। আমাদের মতো দারিদ্র্যপীড়িত ও জনবহুল দেশে দারিদ্র্যবিমোচন এবং সবার জন্য ন্যূনতম খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কি সহজ কথা। নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং গণসাক্ষরতা কর্মসূচী ব্যাপকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে, খাদ্যের ক্ষেত্রে 'একটু ভাত—একটু নুন,' বা 'ডাল-ভাত' এর মতোই শিক্ষার ক্ষেত্রে ন্যূনতম অর্জন নিশ্চিত হলো বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। যাদের অর্থনৈতিক সঙ্গতি ও সামর্থ্য আছে, তারা ভোজনবিলাসী হতে এবং রসনার স্বাদ মেটাতে পারেন পঞ্চান্ন দিয়ে। চর্ব-চোষ্য লেহ্য-পেয় ইত্যাদি নানা ধরনের খাবার দিয়ে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা। অর্থনৈতিক সঙ্গতি-সম্পন্ন এবং সামর্থ্যবানদের পক্ষেই দেশে-বিদেশে নানা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন সম্ভব। বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন ও চাহিদার প্রশ্নেও একই কথা প্রযোজ্য। আর্থিক সামর্থ্যের অধিকারী এবং বিত্তবানরাই পারেন এ সব ক্ষেত্রে সবকিছু নিশ্চিত করতে।

দেশে শিক্ষা বিস্তার এবং গণসাক্ষরতা কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে এসব কথা অনেকটা অনিবার্যভাবেই এলো। আজ গণসাক্ষরতা দিবস। নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং জনগণকে সাক্ষর করে তোলার লক্ষ্যেই এই দিবসটি প্রতিবছর পালিত হয়ে থাকে। এই দিনে এবং নানা প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সাক্ষরতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই আনুষ্ঠানিকভাবে 'গণসাক্ষরতা দিবস' পালনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আমাদের এই জনবহুল, দারিদ্র্যপীড়িত, শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ দেশে অধিকাংশ লোক শুধু যে নিরক্ষর এবং শিক্ষা-বঞ্চিত তাই নয়, তারা নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সাক্ষরতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বও তেমন উপলব্ধি করতে পারে না, লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তাও তেমন বোঝে না। এ কথা নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও বেশী প্রযোজ্য। সমাজের বাস্তব ক্ষেত্রে যেমন এর নজির আছে, তেমনি নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন মাধ্যমের প্রচার প্রচারণায়—বিশেষতঃ টেলিভিশনের প্রচার-নাটকেও এর উদাহরণ মেলে। প্রসঙ্গত, নারী শিক্ষা সম্পর্কিত একটি ফিচারের কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে জনৈক নিরক্ষর ও শিক্ষাবঞ্চিত এবং দারিদ্র্য-পীড়িত গ্রামীণ কৃষক পিতা তার অতি অল্পবয়সী কন্যাকে স্কুলে পাঠানোর প্রশ্নে সরলমনে ও অকপটচিত্তে উচ্চারণ করে যে মেয়েদের লেখাপড়া করে কি হবে? সেকি জজ-ব্যারিস্টার হবে? এই জিজ্ঞাসার জবাবে জনৈক অন্ধ ও প্রবীণ বয়সী এবং ভূয়োদর্শী মহিলা যখন বলেন যে, লেখাপড়া শিখে জজ-ব্যারিস্টার হতেও তো পারে, মানুষই তো জজ-ব্যারিস্টার হয়, গরু-ছাগল তো হয় না। বৃদ্ধার এই কথায় বালিকার পিতার অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায় এবং সে তার কন্যাকে পুনরায় স্কুলে পড়ার জন্য পাঠায়।

আলোচ্য ফিচার-নাটকে কয়েকটি চরিত্রের এবং প্রতীকের মাধ্যমে শিক্ষার—বিশেষতঃ নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত, চোখ থাকতেও যে আমরা অনেকেই অন্ধ, ভবিষ্যত সম্ভাবনা যে আমাদের নজরে পড়ে না, অন্যদিকে প্রকৃত অন্ধেরও যে তৃতীয় নয়ন এবং ভবিষ্যত দৃষ্টি থাকতে পারে, সেটাই উক্ত ফিচার-নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত, আমাদের দেশে একালেও অধিকাংশ লোকের—বিশেষতঃ গ্রামীণ সমাজের শিক্ষাবঞ্চিত লোকের ধারণা, 'জজ-ব্যারিস্টার' না হতে পারলে, ভালো চাকরি-বাকরি না পেলে লেখাপড়া করে ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে কি লাভ? বৃটিশ আমলের সেই পুরনো প্রবাদ 'লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে'। লেখাপড়া করলে এবং উচ্চশিক্ষা নিলে অনেকের ভাগ্যেই বড় চাকরি-বাকরি মেলে এবং গাড়ি-ঘোড়া চড়ার সুযোগও হয়। যদিও, লেখাপড়া তেমন না শিখে এবং উচ্চশিক্ষা না নিয়েও আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশেও বহুজন বিত্তবেসাতের মালিক হয়েছে, গাড়ি-ঘোড়াও চড়ছে। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য তো কেবল গাড়ি-ঘোড়া চড়া নয়। সাক্ষরতা অর্জনের প্রশ্নেও একই কথা। নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং গণসাক্ষরতা অর্জনের ফলে দেশের সবাই গাড়ি-ঘোড়া চড়ার সুযোগ পাবে, এমন নয়।

তবে দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে সাক্ষর করে তুলতে পারলে, তাদের পড়তে ও লিখতে শেখানো গেলে, তারা নিজেরাই অনেকখানি আলো পাবে, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। আর তা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে।

একালে আমাদের দেশে সাক্ষর ও শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, মক্তব-মাদ্রাসা ইত্যাদি সর্বপর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এতেই সন্তুষ্টিবোধ করার অবকাশ নেই। কেননা, নিরক্ষরতা ও শিক্ষার অভাব শুধু ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের জন্যই নানা ধরনের অন্তরায় ও উন্নয়নের প্রতিবন্ধক নয়, দেশ এবং জাতির জন্যও তাই। কেননা, ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের সমবায়েই দেশ ও জাতি। ব্যাপক নিরক্ষরতা এবং শিক্ষার অভাব যেমন ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়নের অন্তরায় হয়ে আছে, তেমনি সামগ্রিকভাবে দেশ এবং জাতির জন্যও। এ সত্য তো অনস্বীকার্য যে, যে-জাতি যত বেশী শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত। সাক্ষরতা ও শিক্ষার উচ্চহারের ওপর জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কেননা, জাতীয় সম্পদ ও জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্যমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করতে হলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সাক্ষরতা কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং শিক্ষার বিস্তার ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমাদের দেশে যে বিপুল জনশক্তি ও সম্পদ রয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে জাতীয় উন্নয়ন এবং দারিদ্র্যবিমোচনের স্বার্থেই গণসাক্ষরতা কর্মসূচী সর্বতোভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে।

—নাগরিক